নদীর ঘাটে বন্ধু

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

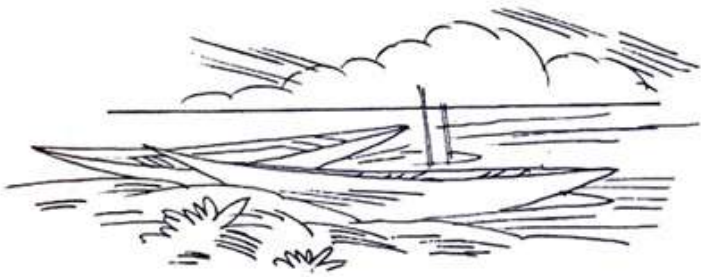

পুনশ্চ

সূচিপত্র

পাকা জায়গা ॥ ৭
মানুষের মতো মানুষ ॥ ১২
হাতিঘর ॥ ১৫
তিতুর বাগান ॥ ১৮
পাখিদের ভাষা ॥ ২১
কুড়িয়ে পাওয়া ॥ ২৫
ডোবার খোঁজে ॥ ২৮
ঝুমঝুমি ॥ ৩১
গাছ আমাদের বন্ধু ॥ ৩৪
প্রজাপতির আবেদন ॥ ৩৮
জঙ্গল-সাফারি ॥ ৪০
কি হতে চাই ॥ ৪৩
আমার প্রিয় জন্তু ॥ ৪৮
পরীক্ষা ॥ ৫১
নদীর ঘাটে বন্ধু ॥ ৫৫
বিচ্ছু ॥ ৫৯
হাত বাড়াও ॥ ৬৪
ভালো কাজ ॥ ৭০
তির-ধনুক ॥ ৭৫
আমি তরঙ্গিনী ॥ ৭৯
কনফিউশন ॥ ৮৫
এক্সসেলেন্ট ॥ ৯৪
সাধুবাবা ॥ ৯৭
দলছুট ॥ ১০৬

॥ পাকা জায়গা ॥

সন্ধের মুখে ব্যালকনির দরজা খোলা দেখে খব বিরক্ত হল বাড়ির কর্ত্রী মধুপা। গজগজ করতে করতে দরজার দোরগোড়ায় পৌঁছানোর আগেই দেখতে পেল সামনের বাড়ির ঝিনি মুখ ভ্যাঙাচ্ছে আর পা দেখাচ্ছে। কাকে দেখাচ্ছে বুঝতে অসুবিধা ছিল না। কারণ এই বারান্দা থেকে তার মেয়ে মিমিও একই কাজ করছে। দুজনের পাশে দুটি কুকুর। তারাও মনিবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেজ নাড়াচ্ছে আর পা দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকির ভু-উ ভু-উ... আর রকির ভৌ ভৌ!

এটা মধুপার দেখা নতুন ঘটনা নয়। প্রথমে মিষ্টি কথার সংলাপ দিয়ে শুরু হয়ে ঝগড়ার চরম স্টেজের পরিণতি এটা। মিমির কুকুর কুকি আর ঝিনির কুকুর রকিকে কেন্দ্র করে দুজনের ঝগড়া মারপিট পর্যন্ত গড়াতেই পারত, যদি না মাঝখানে একটা আস্ত রাস্তা থাকত। অথচ দুজনে সেই নার্সারি ক্লাস থেকে এক ইস্কুলে পড়ছে এক স্কুলবাসে যাতায়াত করছে। যখন বেস্ট ফ্রেন্ড কথার মানে বুঝত না, তখন দুজনেই ডিক্লেয়ার করত—তারা বেস্ট ফ্রেন্ড! এখন ক্লাস থ্রি-তে উঠে নিজেদের ওস্তাদ ভাবতে শুরু করেছে। যত নষ্টের গোড়া ওই কুকুরদুটো। বলা নেই কওয়া নেই একদিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে একটা কুকুরছানা এনে হাজির করেছিল মিমি। ঝিনির মা কেমন রিসেপশন দিয়েছিল জানেনা মধুপা। কিন্তু মিমি মোটেই ভালো রিসেপশন পায়নি।

জেরা করাতে মিমি বলেছিল, ইস্কুলের গেটের পাশে একটা কুকুর চারটে বাচ্ছা দিয়েছে। তারমধ্যে একটা বাচ্ছা কাল বাসচাপা পড়ে মারা গেছে। আর একটা মরোমরো হয়ে আছে। সেইজন্যে দারোয়ানকাকু আমাদের দুজনকে কুকুরছানা দুটো দিয়েছে। তা নাহলে ওরাও মরে যাবে। কারণ মা-কুকুরটা খুব অসুস্থ।

তাও মায়ের গম্ভীর মুখ দেখে মিমি বলেছিল, মা, প্লিজ এত নিষ্ঠুর হয়োনা মা। ওরা একটু বড়ো হলে রাস্তায় ছেড়ে দেব—ঝিনিও তাই করবে বলেছে। প্লিজ মা প্লিজ!

মনুষ্যত্বের প্রশ্ন এসে পড়ায় মধুপা আর না করতে পারেনি। তবে বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, কুকুর নিয়ে বাড়াবাড়ি চলবে না কিন্তু। আর ঠিক ছ-মাস পরে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া!

বললে কি হবে কুকুর নিয়ে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি মিমির। মিমির হাবভাব দেখে মনে হয়—কুকিকে ছাড়া ও এতদিন বেঁচে ছিল কীভাবে!

সেসব মানিয়ে নিয়েও দিব্যি চলছিল। ইতিমধ্যে কুকি বেশ বড়োসড়ো হয়ে গেছে। দেখতেও খুব সুন্দর। রকিও অনেকটা একইরকমের। কুকুরগুলো যত বড়ো হচ্ছে, যত বেশি কায়দা-কেতা শিখছে, মিমি আর ঝিনির মধ্যে ততই ঝগড়া বাড়ছে।

একদিন মিমি জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মা, কুকি আর রকি যে ভাইবোন, ওরা তা জানে!

সত্যি তো! এরকম কথা তো মধুপা আগে ভাবেনি! বলল, কি জানি! মনে হয় না জানে। কারণ ছোটো অবস্থায় আলাদা জায়গায় বড়ো হলে মানুষের বাচ্ছাকেই ভাই-বোন চিনিয়ে দিতে হয়। কুকুরের বাচ্ছা কি করে চিনবে!

আর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, কুকিকে যদি রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়, ও ওর মাকে কি করে চিনবে মা! এও বেশ কঠিন প্রশ্ন।

মধুপা বলেছিল, না চিনলেও তো ক্ষতি নেই। ওরা মানুষের বাচ্ছার মতো নয়। একটু বড়ো হলেই স্বনির্ভর মানে সেলফ-ডিপেনডেন্ট হয়ে যায় ওরা। দেখছ তো, কুকির এখনো একবছর বয়স হয়নি, অথচ কত বড়ো হয়ে গেছে! আর তুমি! তোমাকে এখনো খাইয়ে না দিলে ভালো করে খাওয়া হয় না। তবে ঝিনির সঙ্গে যখন ঝগড়া করো, তখন আর ছোটো মনে হয় না!

॥ দুই ॥

কুকির ওপরে মায়া পড়ে গেলেও মিমির কুকি-সর্বস্বভাব মধুপার যথেষ্ট বিরক্তির কারণ। কুকি এবাড়িতে আসার পর থেকে মধুপার বাপেরবাড়িও যাওয়া হয়নি। গ্রীষ্মের ছুটি আর বড়োদিনের ছুটিতে বাঁধা ছিল বাপের বাড়ি মালদায় যাওয়া। মা-বাবা-ভাই সকলেই খুব দুঃখিত হয়ে আছে মধুপা এতদিন মালদা যায়নি বলে। বাবার শরীরটাও তেমন ভালো নয়। মাঝে মাঝে মনটা হু হু করে ওঠে। কিন্তু কুকিকে রেখে মিমি কোথাও যাবে না ঘোষণা করে দিয়েছে। তার অত প্রিয় দাদু-দিদান, মামুসোনা সবাইকে পর করে দিল ওই এক কুকি। ছ-সাতমাস পেরনোর পরে কুকিকে নিয়ে মিমির শপথের কথা অনেকবার মনে করানো হয়েছে মিমিকে। উত্তরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে শুধু কান্নাকাটি করেছে।

মালদা যেতেও ওর কোনো আপত্তি নেই। একটাই শর্ত কুকিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তা সম্ভব নয় বলে যাওয়া হচ্ছে না। মিমির বাবা শান্তনু পরিষ্কার বলে দিয়েছে—কুকির দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তার নেই।

সামনেই বড়োদিনের ছুটি। মালদা থেকে ঘনঘন ফোন আসছে। মধুপা সিদ্ধান্ত নিল, মিমিকে তার বাবার কাছে রেখেই কদিন ঘুরে আসবে। সেকথা শুনে মা-বাবা-ভাই সবাই জানিয়ে দিল মিমিকে ছাড়া মধুপার ওখানে প্রবেশ নিষেধ। অন্যসময় হলে হয়তো একথায় মধুপার আনন্দই হত। কিন্তু আজ বুকের কোথায় যেন একটা আঘাত লাগল। তার মানে বাপের বাড়িতে মিমিকে ছাড়া তার নিজের এখন আর কোনো গুরুত্বই নেই।

মিমির বাবা শান্তনু খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অনেকদিন অনেক ব্যাপারে মধুপার সঙ্গে ঝগড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু মধুপার মনে হয়েছে, শান্তনুর জীবনের লক্ষই যেন—ঝগড়া না করা। তাই কোনো বিতর্কই ঝগড়া পর্যন্ত পৌঁছয় না। মধুপার মনে হয় এটাও বাড়াবাড়ি। কখনো কখনও ঝগড়ারও প্রয়োজন আছে—নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্যে।

পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর হয়ে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে আন্দাজ করে শান্তনু সামাল দেবার চেষ্টা করল। সেদিন অফিস থেকে ফিরে কর্তব্যপরায়ণা মধুপার গোমরামুখের দিকে তাকিয়ে

বলল, আমি ভাবছি একবার দায়িত্ব নিয়েই দেখা যাক—কুকিকে সামলানো যায় কিনা। ধরো রামু তো পটি-ফটির হাঙ্গামা যেমন সামলায় সামলাবে। কাজের মাসিকে যদি সন্ধে সাতটা পর্যন্ত থাকতে বলা হয়, আশা করি অরাজি হবে না। বাকি সময়টা কুকিকে সামলানো কঠিন হবে না মনে হয়। সেক্ষেত্রে তোমরা কদিনের জন্যে মালদা ঘুরে আসতে পারো।

মধুপা বলল, হঠাৎ এমন বোধোদয়! যাই হোক ভাবনাটা তোমার মন্দ নয়। কিন্তু আসল পয়েন্টটাই গুলিয়ে ফেলেছ। তোমার মেয়ে কি কুকিকে ছেড়ে যাবে?

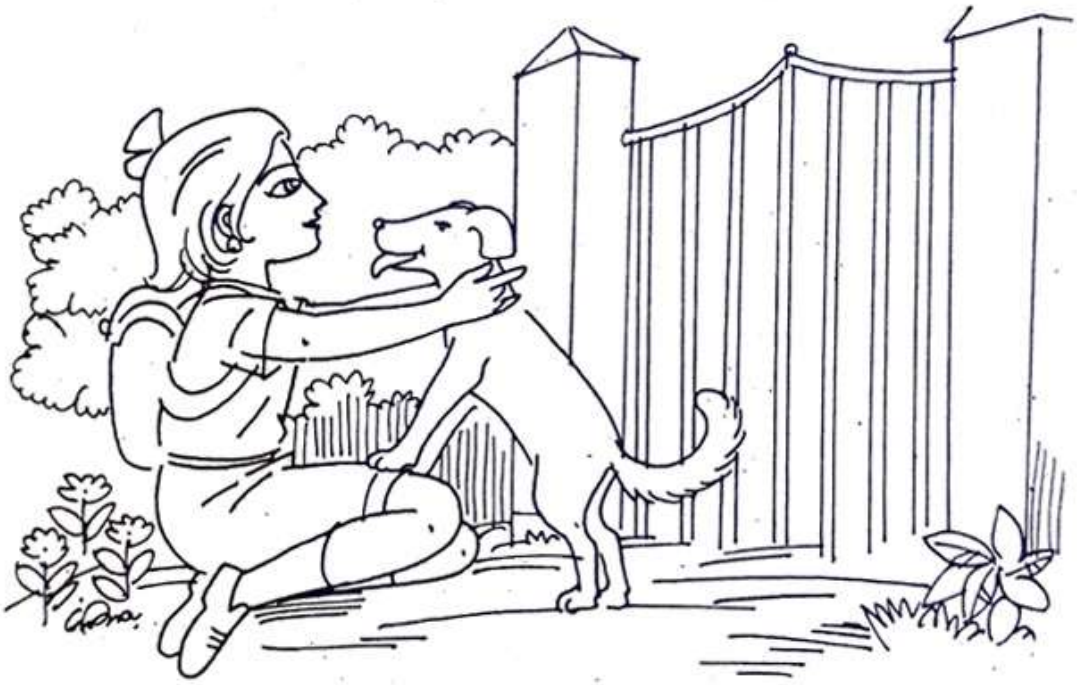

—সেটা যে আমি ভাবিনি তা নয়। ওকে বোঝানোর দায়িত্ব আমি নিলাম।

—আগে ওকে রাজি করাও তারপরে মালদা যাবার কথা ভাবব।

বাবার কথা শুনে প্রথমেই বেঁকে বসল মিমি। বলল, কতবার বলব কুকিকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

শান্তনু বলল, মিমি, শুধু নিজের কি ভালো লাগে ভেবে সংসারে চলা যায় না। তোমার আশেপাশে যারা আছে, বিশেষ করে তোমার প্রিয়জনদের ভালোলাগা খারাপলাগাকে গুরুত্ব দিতে হয়। তুমি তো জানো তোমার দিদানের অ্যাজমা আছে, কেমন শ্বাসকষ্ট হয়। আর পশুপাখির লোম এর জন্যে খুব ক্ষতিকারক। তুমি তাঁর ভালোলাগা ছেড়ে দাও, শরীরের কথাটা ভাববে না! আর একটা কথা বলতো! তুমি তোমার মাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারো!

মিমি ঘাড় নেড়ে বলল, না ভাবতে পারি না।

—তাহলে তোমার মায়ের কথাটা একবার ভাব। কতদিন নিজের মাকে দেখেনি। তার কষ্ট হয় না!

মিমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপরে বলল, আমি মালদা যাব বাবা। তুমি কিন্তু কুকির দায়িত্ব নেবে। রোজ ওখান থেকে আমি কুকির সঙ্গে কথা বলব, ঠিক আছে।

—একদম ঠিক আছে। তাহলে এইকথাই রইল মিমি। আর মত বদলাতে পারবে না কিন্তু।

ভালোমেয়ের মতো ঘাড় নেড়ে মিমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

শান্তনু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক একটা পর্ব আপাতত মিটল।

॥ তিন ॥

বেরোবার সময় তেমন কিছু ঘটল না। গুছিয়ে রাখা বড়ো ব্যাগ আর সুটকেসটা বারকয়েক শুঁকল কুকি। তারপরে মিমির গায়ে গায়ে সেঁটে থাকল-যেমন থাকে। মিমি মায়ের সঙ্গে নানান দরকারে এমনিতেই মাঝেমধ্যে বাড়ির বাইরে বেরোয়। সম্ভবত সেরকম কিছু হবে ভেবে হয়তো কোনো ভাবান্তর হলনা কুকির।

মালদায় পৌঁছানার পর মিমির আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। যখন-তখন মামুসোনার মোটর সাইকেলে চেপে বেরিয়ে পড়ছে। দাদুর সঙ্গে পার্কে এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করছে। দিদানের কোলে শুয়ে গল্প শুনছে। কে বলবে এই মেয়েটাই কুকিকে ছেড়ে কোথাও যাবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল! তবে প্রত্যেকদিন রাতে ঘুমোতে যাবার আগে বাবাকে ফোন করা চাই। ফোনটাকে কুকির মুখের সামনে ধরার নির্দেশ দিয়ে কুকির ভু-উ ভু-উ কাঁই-কুঁই শুনে তারপরে ঘুম।

মালদায় সাতদিন থাকার কথা। দিনচারেক পেরনোর পরে মধুপা ফোনে শান্তনুকে জিজ্ঞেস করল, মিমি নেই কাছে। সত্যি করে বলতো—কুকি কেমন আছে। মিমিকে খুঁজছে না!

শান্তনু বলল, অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার। মিমিকে খুঁজবে না তা কখনো হয়! সবসময় খুঁজছে। ও তো মুখে বলতে পারে না। বারে বারে বারান্দায় যায়। একনাগাড়ে ভু-উ ভু-উ করে ডেকে চলে। করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। রামু বলছে, ভালো করে খাচ্ছেও না। যাকগে ওখানে বসে কুকিকে নিয়ে বেশি ভেবো না। আর তো দু-তিনদিনের ব্যাপার। ম্যানেজ হয়ে যাবে।

চোখের পলকে যেন সাতটা দিন ফুরিয়ে গেল। মালদা স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিল মিমির দাদু দিদান আর মামুসোনা। সবার কান্না দেখে মিমিও কেঁদে ফেলল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—মালদা আসার ব্যাপারে আর মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করবে না।

ট্রেন যথাসময়ে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছল। বাবাকে দেখে প্রথমেই প্রশ্ন করল মিমি, কুকি কেমন আছে?

শান্তনু বলল, ভালো আছে।

বাড়িতে পৌঁছে কোনোরকমে জুতোটা খুলে কুকি কুকি করতে করতে ছুটে ভেতরে চলে গেল মিমি।

শান্তনুর শুকনো মুখ দেখে মধুপা বুঝতে পারল কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। ভেতরে ঢোকার আগেই জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে! কুকি কোথায়! সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

শান্তনু অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, আরে কাল সকাল পর্যন্ত সব ঠিক ছিল, রামু রোজ যেমন সকালবেলায় বাইরে নিয়ে যায় কালও নিয়ে গেল। ফিরল একা। রামুর অন্যমনস্কতার সুযোগে কুকি নাকি এমন দৌড় লাগিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে, ও ট্রেস করতে পারেনি কোথায় চলে গেছে। আমি কাল অফিস যাইনি। সারাদিন রামুকে সঙ্গে নিয়ে ওকে খোঁজার চেষ্টা করেছি। আর কি করার আছে বুঝতে পারছি না।

মধুপার চোখে জল এসে গেল। বলল, এখন কি হবে? মিমিকে কি জবাব দেব বলতো! ও তো এইজন্যেই কুকিকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইত না।

ভেতরে ঢুকে দেখল তখনো মিমি কুকিকে খুঁজে চলেছে। মধুপা বলল, মিমি এখানে এস, চুপটি করে বসো সোনা। কিছু বলার আছে।

মিমির ফরসামুখ ভয়ে সাদা। জিজ্ঞেস করল, কুকির কি হয়েছে মা!

—কুকি গতকাল সকালে রামুর সঙ্গে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল মিমি। মা-বাবাকে আড়ি দেখিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অসহায় মধুপা বলল, হ্যাঁগো কুকিকে কি সত্যিই আর পাবার উপায় নেই!

শান্তনু বলল, আমার অন্তত কোনো উপায় জানা নেই। থানায় নিখোঁজের একটা ডায়েরি হয়তো করা যেত, যদি কুকি নেড়ি কুত্তা না হয়ে কোনো নামী-দামি বিদেশি কুকুর হত। এখানে রাস্তায় শয়ে শয়ে কুকুর ঘোরাঘুরি করছে। খুঁজবে কি করে!

সময়ের মতো ভালো বন্ধু নেই। মিমিও একসময় নিজেকে মানিয়ে নিল পরিস্থিতির সঙ্গে। দুদিন পরে ইস্কুল খুলে গেল। মনমরা মিমি যন্ত্রের মতো স্কুলে যায়-আসে। ঝিনিও আর ঝগড়া করে না। সহানুভূতির দৃষ্টিতে রকিকে পাশে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে মিমির সঙ্গে কথা বলবে বলে। কিন্তু মিমি যেন ভুলেই গেছে, তাদের একটা বারান্দা আছে!

আজ স্কুলবাসের হর্ন শুনে মিমি তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসে হতবাক! গেটের সামনে কুকি দাঁড়িয়ে আছে। মিমিকে দেখে ছুটে এল কুকি। কাঁই-কুঁই-ভুউ-ভুউ নানাভাবে নালিশ জানাল মিমির কাছে। বাসের হেলপারকাকু তাড়া দিচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অবাক মধুপা। মাকে বলল, আজ আমি ইস্কুলে যাব না মা। তুমি প্লিজ কাকুকে চলে যেতে বলে দাও।

মধুপা ইশারায় বাস ছেড়ে দিতে বলল। ঝিনিদের বাড়ির বারান্দা থেকে রকি ডেকে উঠল—ভৌ ভৌ!

মিমি বলল, দেখছ মা, রকিও কত মিস করেছে কুকিকে!

এত খুশি শেষ কবে হয়েছে মধুপা মনে করতে পারল না।

বলল, মিমি, কুকিকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে এস। তোমাকে খুঁজতে কোথায় কোথায় ঘুরে বেরিয়েছে কে জানে। ওকে আগে ভালো করে স্নান করাতে হবে। তারপরে যতখুশি আদর করো। অর্থাৎ মিমিদের বাড়িতে কুকির জায়গাটা পাকা হয়ে গেল!